

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিন্দুত্ববাদ ও অবতার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

টুম্পা খাতুন

রোলঃ ২১৫০০৪০৪

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

হিন্দুত্ববাদ ও অবতার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

টুম্পা খাতুন

রোলঃ ২১৫০০৪০৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “হিন্দুত্ববাদ ও অবতার” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে টুস্পা খাতুন, আইডিঃ ২১৫০০৪০৪ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ হিন্দুত্ববাদ ও অবতার ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ইঞ্জি. খন্দকার মারছুহ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

টুস্পা খাতুন

তারিখঃ

১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

আইডিঃ ২১৫০০৪০৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৬
১/দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব	৮
২/ দাওয়াত না দেওয়ার পরিণাম	৯
৩/ অবতারের পরিচয়	১০
৪/অবতার আগমনের কারণ	১০
৫/অবতার মানুষ নাকি ঈশ্বর	১১
৬/কল্কি অবতার	১১
৭/কল্কি অবতারের আগমন	১২
৮/কল্কি অবতার: মুহাম্মদ (সা:)	১৩
৯/ কল্কি অবতারের গুনাবলি:	১৪
১০/হাজরে আসওয়াদ কি শিবলিঙ্গ	১৮
১১/নরত্বারোপ বা ঈশ্বরের মধ্যে মানব গুণ আরোপ	১৮
১২/ হিন্দুধর্মে পুনর্জন্মের ধারণা	২০
১৩/ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন	২৫
১৪/মুসলামরা কি কা'বা ঘরকে সেজদাহ করে	২৭
১৫/হিন্দুধর্মে জাতিভেদ প্রথা	২৯
১৬/কখন থেকে জাতিভেদ প্রথা শুরু	
১৭/ব্রাহ্মণ	৩১

১৮/ ক্ষত্রিয়	৩১
১৯/বৈশ্য	৩১
২০/ শূদ্র	৩২

ভূমিকা

সকল প্রকার স্তুতি এবং পবিত্রতা ঐ মহান রবের তরে যিনি এই বিশ্বজাহানের মালিক।
অসংখ্য দুরূদ ও সালাম সেই মহামানবের প্রতি যিনি ছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য
হেদায়েতের নূর। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত মুহাম্মদ (সা:) পৃথিবীর বুকে যেন সুবাসিত শুভ্র ফুল। যার পদকম্পনে ভেঙ্গে
গিয়েছিল জাহেলিয়াতের সকল শৃংখল। যার হাত ধরে ধরণী পেয়েছিল এক নতুন পথের
দিশা। সেই মহামানব যে, উম্মাতী উম্মাতী বলে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাকেই চিনতে
পারলাম না আমরা। না তাকে চেনাতে পারলাম আমাদের অমুসলিম ভাই-বোনদের। এই
বই মূলত হিন্দু ভাই-বোনদের দাওয়াত দেওয়ার নমুনা স্বরূপ একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

যুবায়ের আহমাদ উস্তাযের কথাগুলো এতোটাই আপ্লুত করেছে মাঝে মাঝে নিজেকে
দায়ী হিসেবে আবিষ্কার করার দুঃসাহস মনে উঁকি দেয়। যদিও ঐ পরিমাণ ইলম নেই
তবুও উস্তাযের অনুপ্রেরণায় উম্মাহর জন্য ফিকির করতে শিখছি। আমরা আমাদের
চারপাশে অমুসলিমদের সাথে উঠাবসা করি, তাদের সাথে বন্ধুত্বের ভাব জমায়, সেই
চিরচেনা মুখ গুলোকে ভালোবেসে ফেলি কিন্তু তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে
বাঁচানোর কোন প্রয়াসই আমাদের থাকে না। আমার ভাই-বোন জাহান্নামের লাকড়ি
হচ্ছে কিন্তু আমি অবলীলায় হাসি খুশিতে দিনাপাতি করছি। এ নিয়ে আমাদের কোন
মাথা ব্যাথাই যেন নেই। রাব্বের কারীম আমাদের দিলের মধ্যে উম্মাহর ফিকির দিয়ে
দেন। আমীন।

আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের সুযোগ করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় ইঞ্জি. খন্দকার মারছুছ
উস্তায। প্রয়োজনীয় তথ্য ও রেফারেন্স পেয়েছি যুবায়ের আহমাদ উস্তাযের বই 'হিন্দু
ভাইদের দাওয়াত দেওয়ার পথ ও প্রদ্ধতি' এবং বিশিষ্ট দায়ী ডা. জাকির নায়েক
মুহতারাম এর 'হিন্দুধর্ম ও ইসলাম' এবং 'ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য'
বই থেকে।

সবকিছুর ঊর্ধ্বে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা,যিনি তার স্বীয় করুণায় আমার মতো গুনাহগার বান্দীকে এ কাজের তাওফীক দিয়েছেন।এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে আল্লাহ কবুল করে নিন।আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

দাওয়াত দেওয়ার গুরুত্ব

অমুসলিম ভাই-বোনদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া আমাদের উপর ফরজ। আর ফরজ কাজ আমাদের করতেই হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ
طُبْمٌ شَرٌّ الْبَرِيَّةِ

অর্থ:আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।^{১০}

যদি দেখি আমার অমুসলিম কোন প্রতিবেশী আগুনে পুড়ছে তাহলে কি আমি হাত গুটিয়ে বসে থাকব?এটা আদেও সম্ভব আমার পক্ষে?আমার মানবতা কি বলে?

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলে দিয়েছেন, মুশরিকরা আগুনে জ্বলবে চিরস্থায়ীভাবে।আমাদের সহপাঠী, অফিসের কলিগ, প্রতিবেশী অমুসলিম ভাইয়েরা আমাদের চারপাশে সহাস্য বদনে ঘুরে বেড়ায়।একবার ভেবে দেখেন,এই চেনা মুখগুলো আগুনে পুড়ছে।এটা ভাবতেই दिलের ভিতর কেমন ছাত করে উঠে! কাছের এই মানুষগুলোকে উদ্ধার করার কোন রাস্তা কি খোলা নেই?

আছে। আমাদের দায়িত্ব তাদেরকে জান্নাতের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া।তাদের সতর্ক করা ভাই এঁটা আগুনের রাস্তা আর এটা শান্তির।

কোন অবুঝ শিশু যদি না বুঝে আগুন ধরতে যায় তাহলে কি আমরা বসে থাকি? না।যত দ্রুত সম্ভব শিশুটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসি।তেমনই তো আমার অমুসলিম ভাই-বোন।তারা তো অবুঝ শিশুর মতোনই।তাই তাদেরকে সঠিক টা বোঝানোর দায়িত্ব আমাদের।

প্রতিদিন আমার নবীর কতশত উম্মত চিরস্থায়ী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে।

আসুন আমরা তাদেরকে জান্নাতের পথে ডাকি। তাদেরকে জানানো আমাদের দায়িত্ব।দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার।মানা না মানাও তাদের এখতিয়ার। আল্লাহ্

তা আবার আমানত ইসলাম তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তাওফীক দান করেন মালিক। আমীন

দাওয়াত না দেওয়ার পরিণাম

বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা উম্মতের চরম সংকটাপন্ন অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। কেন মুসলিমরা এতো মার খাচ্ছে? কেন তারা এতো নির্যাতিত? মুসলিমের সেই সোনালী আধিপত্য কেন দাস্যত্বে পরিণত হচ্ছে?

তার একটা বড় কারণ অমুসলিমদেরকে দাওয়াত না দেওয়া। তাদের অধিকার আদায় না করা। তাদের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেওয়া আমার দায়িত্ব। এবং এটা তাদের হক।

আপনি যদি কারো হক আদায় না করেন। তার প্রাপ্য অধিকার যদি তাকে না দেন। তাহলে সে তো আপনার উপর চড়াও হবে এটাই স্বাভাবিক! সে যে কোন ভাবে আপনার উপর প্রতিশোধ নিবে।

আপনার পাওনাদার ততক্ষণ পর্যন্ত শান্ত হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাকে তার পাওনা বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তেমনি অমুসলিমরা তো আমাদের পাওনাদার। আর তা হলো ইসলাম। আর পাওনা অনাদায়ের জন্য মুসলিমদের এমন শোচনীয় পরিণতি। এটা তো দুনিয়ার শাস্তি।

ভাবুন একবার, আল্লাহ যদি কিয়ামতে দিন কোন অমুসলিমকে জিজ্ঞেস করে তোমার কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? সে যদি নেতিবাচক উত্তর দেয়। আর আপনার নাম ধরে বলে ওমূকের সাথে একই দোকানে বসে কত চা খেয়েছি। একসাথে কত গল্প করেছি। কই ওমূক তো আমাকে কখনো সতর্ক করেনি।

আপনি তখন কি কৈফিয়ত দিবেন ভেবে দেখেছেন?

মহান রব্ব আমার এমন ভয়াবহ পরীক্ষার সম্মুখীন না করুন। আমীন।

অবতারের পরিচয়

অবতার একটা সংস্কৃত শব্দ।যেখানে অব' অর্থ নিচে এবং 'তর' অর্থ নামা। সুতরাং অবতার অর্থ নিচে নামা বা নিচে নেমে আসা। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে অবতার শব্দের অর্থ:(হিন্দু পুরাকাহিনীতে) কোন দেবতা বা মুক্ত আত্মার রক্তমাংশের শরীর নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসা। সাধারণ হিন্দুদের মতে অবতার হলো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মানুষের রূপে দেহ নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসা।হিন্দুদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদের কোথাও অবতার কথাটির উল্লেখ নেই।

অবতারের আগমনের কারণ

ভগবদগীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৭-৮:

"যেখানেই ন্যায়ের অবক্ষয় দেখা দেয়,হে ভারত, এবং অন্যায় অবিচার বেড়ে যায়,তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করি।শিষ্টের পালন, দুষ্টের দমন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি প্রত্যেক যুগেই জন্ম গ্রহণ করি"।

সাধারণ হিন্দুরা বিশ্বাস করে, ধর্মকে রক্ষার জন্য, দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য বা মানব জাতির জন্য বিধিবিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বর রক্তমাংশের শরীর নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন।

অবতার মানুষ নাকি ঈশ্বর

: সাধারণ হিন্দুদের মতে, অবতার হলেন ঈশ্বর, যিনি মানুষের রূপে দেহ নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন সমাজ সংস্কারের জন্য। কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতদের মতে, অবতার ঈশ্বর নন। অবতার হলেন ঈশ্বর প্ররিত বিশেষ মানব।

কষ্কি অবতারের পরিচয়

হিন্দু ধর্মের পরিভাষায় নবী রাসূলকে অবতার বলে।

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ অনুসারে যুগকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

ক/সত্য যুগের সময়কাল ও অবতার: এ যুগের সময়সীমা হলো সতের লক্ষ আঠাশ হাজার বছর (১৭,২৮,০০০)। এ যুগের অবতার চারজন। যথা:

১/মৎস অবতার (মকর মাছ রূপে)

২/কূর্ম অবতার (কচ্ছপ রূপে)

৩/বরাহ অবতার (শুকর অবতার)

৪/ণ্ডসিংহ অবতার (মুখমণ্ডল ও হস্ত সিংহের, আর নিম্নভাগ মানবাকৃতির)

খ/ ত্রেতা যুগের সময়কাল ও অবতার: এ যুগের সময়সীমা বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার (১২,৯৬০০০)। এ যুগের অবতার তিনজন। যথা:

১/ বামন অবতার (তিন পা বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির মানব রূপ)

২/ভৃশ্রাম অবতার (ব্রাহ্মণ পুত্র, পিতা জমদগ্নি, মাতা রেণুকার গর্ভ জাত)

৩/ শ্রী রাম চন্দ্র অবতার (ক্ষত্রিয় রাজা দশরথের পুত্র)

গ) দ্বাপর যুগের সময়কাল ও অবতার: আট লক্ষ চৌষটি হাজার (৮,৬৪,০০০) বছর। এ যুগের অবতার দুই জন। যথা:

১/শ্রী কৃষ্ণ অবতার(বাসুদেব ও দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান)

২/গৌতম বুদ্ধ অবতার(কপিলাবস্তু রাজা শুক্লোধনের পুত্র)

ঘ) কলি যুগের সময়কাল ও অবতার:

চার লক্ষ বত্রিশ হাজার(৪,৩২,০০০) বছর।এ যুগের অবতার একজন।যথা:

১/ কল্কি অবতার(মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শম্ভল'নগরে বিষুঃযশার
ঔরসে জন্ম নেন।

কল্কি অবতারের আগমণ

উত্তর: হিন্দুরা মনে করেন কল্কি অবতার এখনো পৃথিবীতে আসেন নি।কিন্তু তাদের
ধর্মগ্রন্থকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কল্কি অবতারের আগমন অনেক আগেই
হয়েছে।আর তিনি হলেন আমাদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:)।

শ্রীমদভাগবত মহাপুরাণ ১২ স্কন্ধ,২ অঃ ১৯ মন্ত্র...

"অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ

অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ"

এখানে বলা হয়েছে" কল্কি অবতার অশ্বের উপর আসীন হয়ে তরবারি হস্তে দুষ্টের
দমন করবেন"।

কল্কি অবতার ঘোড়ায় আসীন হয়ে যুদ্ধ করবেন।যদি অবতার এখনো না এসে থাকেন
তাহলে আর কবে আসবেন? এখন কি ঘোড়ার চড়ে যুদ্ধের যুগ আছে?

এখন ট্যাঙ্কের যুগ,বিমানের যুগ।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন কঙ্কি অবতার

আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ (সা:) হলেন কঙ্কি অবতার।

কঙ্কি অবতারের যেসকল গুণাবলী হিন্দুধর্মে উল্লেখ আছে তা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর সাথে মিলে যায়।

ঋগ্বেদে আছে,

কঙ্কি অবতারের নাম হলো 'নরাশংস'¹ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা। যার বাংলা অর্থ 'মানব প্রশংসিত' এবং আরবি অর্থ হলো মুহাম্মদ। আর আমাদের শেষ নবীর নাম ছিল মুহাম্মদ (সা:)।

কঙ্কি অবতারের মায়ের নাম 'সুমাতি'² সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা অর্থ 'নিরাপদ-শান্তি'। আর এর আরবি অর্থ হলো 'আমেনা'। আর 'আমেনা' হলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) এর মায়ের নাম।

কঙ্কি অবতারে পিতার নাম হলো 'বিষ্ণু যশা'³ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা। যার বাংলা অর্থ 'মালিকের দাস' এবং আরবি অর্থ হয় 'আব্দুল্লাহ'। আর আব্দুল্লাহ হলো শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) এর পিতার নাম।

কঙ্কি অবতারের জন্মস্থানের কথা বলা হয়েছে যে, তিনি 'শম্ভল'⁴ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন। 'শম্ভল' সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা অর্থ 'শান্তির স্থান'। আর আরবিতে হয় মক্কা। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই তো অশ্বের উপর আসীন হয়ে তরবারি হাতে দুষ্টের দমন করেছেন।⁵

কঙ্কি অবতারের জন্ম তারিখ:

"মাধব মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন"⁶

"দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্যে মাধবে মাসি মাধবঃ"

মাধব অর্থ বৈশাখ মাস, বিক্রমী ক্যালেন্ডার মতে বৈশাখকে বসন্তের মাস বলা হয়, যার আরবি অর্থ হয় 'রবি'। শুক্ল পক্ষ, অর্থাৎ প্রথম অংশ আরবিতে বলা হয়

'আউয়াল'।একত্রে হয় 'রবিউল আউয়াল' দ্বাদশ তারিখ অর্থাৎ ১২ তারিখ।সকল মানুষের সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'রবিউল আউয়াল' মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন।

অন্তিম অর্থাৎ কঙ্কি অবতারের গুণাবলী:

১/ মিষ্টভাষী (বা বাণীর মাধুর্য)

ঋগ্বেদে নরাশংসকে মধুজিহ্বা (মধুর ভাষী, মিষ্টভাষী বা মধুকণ্ঠী) বলে অভিহিত করা হয়েছে।

'মধুজিহ্বাং হবিস্কৃতম'^৭

অর্থ:তার বাণী (ভাষা)হবে মধুর

পক্ষান্তরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বড় গুণ ছিল যে তার ভাষা ছিল খুবই মিষ্ট ও সুমধুর।তার মধুর মধুর কথা শুনে অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে।

২ অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী:

নরাশংসকে অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে।এই বিশেষত্বের বর্ণনার প্রথমে ঋগ্বেদে 'স্বর্চি' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সুন্দর বা দিব্যকান্তিযুক্ত।

'নরাশংস প্রতি ধামান্যজুন তিস্রো দিবঃ প্রতি মহা স্বর্চি'^৮

এর তাৎপর্য হলো এমন অসরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী যার চেহারা থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়।

৩/ তিনি ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিবেন:

ঋগ্বেদে আরো বলা হয়েছে যে, তিনি ঘরে ঘরে আপন মহত্ত্বের আলোকদ্যুতি পৌঁছে দিবেন।

"ঘৃত প্রাণা মনসা হব্যমৃন্দনুর্ধ্বজস্য সমনভু দেবান"^৭

উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত করেছিলেন এবং অন্ধকার(জাহেলিয়া) থেকে মানুষকে আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন।

৪/ পাপথেকে উদ্ধারকারী:

ঋগ্বেদে নরাশংসকে ' জনসাধারণের পাপ থেকে উদ্ধারকারী ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

" রথং ন দুর্গাস্বসবঃ সুদানবো বিশ্বশ্মানো(অংহসো) নিম্পিপতর্ন"^{১০}

সকল পাপ থেকে আমাদের উদ্ধারকারী।

একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সমস্ত শিক্ষা তাঁর উপর অবতীর্ণ কুরআন একটি পাপকর্মহীন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। এ হলো সৎ পথের একটি আয়না যার নির্দেশনা সব রকমের পাপাচার থেকে মুক্তির উৎস।

৫/গুণ্ডাঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত হবে(খতনাকৃত হবে)

ভগবত পুরাণে আছে কল্কি অবতার গুণ্ডাঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত থাকবে অর্থাৎ খতনাকৃত থাকবে।

" বিচরনশূনা ক্ষোণ্যাং হয়েনাপ্রতিমদ্যুতিঃ।

নৃপলিঙ্গচ্ছদো দস্যুন কোটিশো নিহনিষ্যতি"11

অর্থাৎ তিনি বেগবান অশ্বে বিচরণকারী, অপ্রতিম, কাস্তীময়, গুপ্তাঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত, রাজবেশে অসংখ্য গুপ্ত দস্যুকে সংহার করবেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুপ্তাঙ্গের অগ্রভাগ ছেদিত ছিল। তিনিও রাষ্ট্র প্রধান হন এবং রণাঙ্গনে অসংখ্য গুপ্তশত্রুকে দমন করেছেন।

৬/ চার সঙ্গীর সহিত করি দমন

কব্জি পুরাণে উল্লেখ আছে যে, কব্জি অবতার তাঁহার চারজন সঙ্গীকে নিয়ে কলি অর্থাৎ শয়তানকে নিবারণ করবেন।

"চতুর্ভিত্তাত্তির্দেব। করিষামি কলিঙ্কয়ম"12

তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সহচরগণের সহিত শয়তানকে নিবারণ করেছেন। সেই চারজন একান্ত অনুগত সহচরগণ হলেন- (১) হযরত আবুবকর রা. ২) হযরত উমর রা. ৩) হযরত উসমান রা. ৪) হযরত আলী রা.

৮/ শরীর হতে সুগন্ধি বের হওয়া

কব্জি অবতারের শরীর হতে সুগন্ধি নির্গত হবে। তার সৌরভ মানুষের মন নির্মল ও পবিত্র হবে।

"বাসুদেবাস্যগন্ধানিলস্পাশান"13

এই গুণটিও নবীজী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মিলে যায়। কারণ তাঁর শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হত। তিনি যেই পথে যেতেন সে পথে কিছুক্ষণ পরে কেউ চললে বুঝতেন এই পথে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিয়েছেন। কারণ সে পথ সুবাসিত হতো।

৮/ জগতগুরুভাগবত

পুরাণে কব্জি অবতার 'জগতপতি' বলা হয়েছে। যিনি উপদেশবলী দ্বারা নিপাতী পৃথিবীকে উদ্ধার ও রক্ষা করেন, তাঁকে জগতপতি বলা হয়। তিনি নির্দিষ্ট কোন জাতির

গুরু নহেন, তিনি হলেন সমগ্র বিশ্বের গুরু। এই দৃষ্টিকোণে দেখা যায় যে, কুরআন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র বিশ্বের নবী ঘোষণা করা হয়েছে।

(¹)ঋগ্বেদ ১/১৮/৯,

(²)ঋগ্বেদ সংহিতা ১ম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা।

(³) কঙ্কি পুরাণ ১/২/১১

(⁴)কঙ্কি পুরাণ ১/২/৪

(⁵)শ্রীমদভাগবত মহাপুরাণ ১২ স্কন্ধ, ২ অঃ ১৯ মন্ত্র

(⁶)কঙ্কি পুরাণ ১/২/১৫

(⁷) ঋগ্বেদ ১/১৩/৩

(^{8,9})ঋগ্বেদ ২/৩/২ মন্ত্র

(¹⁰)ঋগ্বেদ ১/১০৬/৪

(¹¹)ভাগবত পুরাণ ১২ স্কন্ধ ২ অঃ ২০ মন্ত্র

হাজরে আসওয়াদ কি শিবলিঙ্গ

না। হাজরে আসওয়াদ একটি পবিত্র পাথর। এটি একটি আরবি শব্দ 'হাজার' অর্থ পাথর আর 'আসওয়াদ' অর্থ কালো। যার পুরো অর্থ দাড়ায় কালো পাথর। কিন্তু এটাকে শিবলিঙ্গের সাথে তুলনা করা যাবে না। হাজরে আসওয়াদ' বেহেশতের মর্যাদাপূর্ণ একটি পাথর। হজযাত্রীরা হজ করতে গিয়ে এতে সরাসরি বা ইশারার মাধ্যমে চুম্বন দিয়ে থাকেন।

হাজরে আসওয়াদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হাদিসের গ্রন্থগুলোতে প্রচুর আলোচনা এসেছে। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'হাজরে আসওয়াদ একটি জান্নাতি পাথর। তার রং দুধের চেয়ে বেশি সাদা ছিল। এরপর বনি আদমের পাপরাশি এটিকে কালো বানিয়ে দিয়েছে।' (জামে তিরমিজি : ৮৭৭, মুসনাদে আহমাদ, ১/৩০৭, ৩২৯)

নরত্বারোপ বা ঈশ্বরের মধ্যে মানব গুণ আরোপ:

ক. মানুষকে বোঝার জন্য স্রষ্টার বা ঈশ্বরের মানুষের রূপ ধারণের প্রয়োজন নেই:

সেমিটীয় নয় এমন অনেক ধর্মেই কোন না কোন পর্যায়ে প্রাণী বা বস্তুতে নরত্ব আরোপের, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার মানুষের রূপ ধারণের দর্শনে বিশ্বাসের কথা বলা হয়। যারা ঐতে বিশ্বাস করে তাঁদের যুক্তির মধ্যে কমবেশি সাদৃশ্য রয়েছে। তারা বলে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এতো পূত-পবিত্র যে তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, সমস্যা, অনুভূতি, স্নেহ ভালবাসা, আবেগ এবং আকাজক্ষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তিনি জানেন না যখন কোন মানুষ আঘাত পায় বা বিপদে পড়ে তখন সে কেমন আনুভব করে। সুতরাং মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে নেমে আসেন। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে যুক্তিযুক্ত মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের এটিকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

খ. সৃষ্টিকর্তা একটি নির্দেশিকা তৈরি করেন

ধরুন আমি একটি টেপ রেকর্ডার তৈরি করলাম,তাহলে টেপ রেকর্ডার জন্য টোনটি ভালো বা মন্দ তা বোঝার জন্য প্রস্তুতকারককে নিজেকেই টেপরেকর্ডারের ভূমিকা নেয়ার প্রয়োজন নেই।

সুতরাং,ব্যবহারকারীর জন্য প্রস্তুতকারক হিসেবে আমি একটি ব্যবহার নির্দেশিকা লিখব।এই ব্যবহার নির্দেশিকায় আমি বলব ,অডিও ক্যাসেট শোনার বা চালানোর জন্য ক্যাসেটটি ভেতরে ঢোকান এবং 'প্লে' বাটনে চাপ দিন।বন্ধ করার জন্য 'স্টপ' বাটনে চাপ দিন।আপনি যদি সামনের দিকে যেতে চান, তাহলে ' ফাস্ট ফরওয়ার্ড 'বাটনে চাপ দিন।খুব বেশি ওপর থেকে এটিকে ফেলবেন না যাতে এটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।এটি কে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখবেন না,তাহলে এটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রস্তুতকারকরা একটি ব্যবহার নির্দেশিকা লেখে যাতে কি করা উচিত বা উচিত তাঁর উল্লেখ থাকে।

গ. পবিত্র কুরআন মানবজাতির জন্য নির্দেশনা

তেমনিভাবে মানুষের জন্য কোনটি ভালো বা মন্দ তা জানতে আমাদের মহান প্রভু ও স্রষ্টা, আল্লাহকে (সুবহানাছ ওয়া তা'য়ালা) মানুষের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে আসার প্রয়োজ হয় না। যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তার কেবল ব্যবহার নির্দেশিকা প্রদান করা প্রয়োজন। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এমন একটি নির্দেশিকা মানুষকে নিম্নোক্ত বিষয় অবগত করবে ও ব্যাখ্যা করবে :১) মানব সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য,২) কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন,৩)ইহ ও পরলৌকিক সাফল্য লাভের জন্য তাঁদের কি করি উচিত ও কি থেকে বিরত থাকা উচিত। সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নির্দেশিকা হল পবিত্র কুরআন।

ঘ.আল্লাহ তাঁর দূত বা রাসূল নির্বাচিত করেন:

এ ব্যবহারবিধি লেখার জন্য স্বয়ং আল্লাহর পৃথিবীতে নেমে আসার প্রয়োজন নেই। তিনি মানুষের মধ্যে থেকে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য একজনকে নির্বাচন করেন এবং ওহির মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন। এধরনের নির্বাচিত ব্যক্তিকেই বলা হয় আল্লাহর বাণী প্রচারক বা নবী। এসব নির্বাচিত মানবের কাছেই আল্লাহ তাঁর বাণী প্রেরণ করেন।

হিন্দুধর্মের পুনর্জন্মের ধারণা:

অধিকাংশ হিন্দুই জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জন্ম লাভ-এই চক্রে বিশ্বাসী, যাকে বলা হয় 'সংসার'। 'সংসার বা পুনর্জন্মের মতবাদ জন্মের পর আত্মার অন্য দেহে গমন বা আত্মার পুনরায় দেহ লাভের তত্ত্বও হিসেবে পরিচিত। এই মতবাদ হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মতবাদ অনুসারে, এমনকি মানুষের জন্মের সময় থেকে মানুষে মানুষে পার্থক্যের কারণ তার পূর্বজন্মের কর্মফল, অর্থাৎ গত জন্মে সে যা করেছে। যেমন, একটি শিশু যদি সুস্থ অবস্থায় জন্মায় এবং আরেকটি শিশু যদি প্রতিবন্ধী বা অন্ধ অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, তবে তার কারণ হিসেবে বলা হয় এটি তাদের পূর্বজন্মে কাজের ফল। যারা এই তত্ত্বে বিশ্বাস করে তারা যুক্তি দেখায় যে যেহেতু এই জীবনে আমরা আমাদের সব কাজের প্রতিফল পাই না তাই একজনের কাজের পরিণতি ভোগ বা সুফল পাবার জন্য অন্য আরেকটি জীবন থাকতে হবে।

১/ভগবদ গীতার ২:২২ নং এ বলা হয়েছে,

মানুষ যেমন পুরানো কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে তেমনি আত্মাও পুরানো ও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে"

ক) বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪:৪:৩ তেও পুনর্জন্মের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে-

"শুয়োপোকা যেমন তৃণফলার চূড়ায় উঠলে নতুন তৃণফলায় আশ্রয় নেয় ঠিক তেমনি আত্মা দেহ ছাড়লে নতুন অস্তিত্বে আশ্রয় নেয়"।

২/ কর্ম-কার্যকরণ বিধি

কর্ম অর্থ হলো কাজ,ক্রিয়া, পদক্ষেপ বা কার্যক্রম এবং এ নিয়ে শুধু আমাদের দেহ যে কাজ করে তাই বোঝায় না বরং আমাদের মন যে কাজ করে তাও বোঝায়।কর্মের প্রকৃত অর্থ হলো ক্রিয়া ওপ্রতিক্রিয়া বা কার্যকরণ বিধি।একে এই প্রবাদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়,

"যেমন কর্ম তেমন ফল"।একজন কৃষক গম রোপণ করে চাল উৎপাদনের প্রত্যাশা করতে পারে না। তেমনিভাবে প্রতিটি সং চিন্তা,বাক্য ও কর্ম একই ধরনের ফলাফল দান করে যা আমাদের পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করে, আবার প্রতিটি নিষ্ঠুর চিন্তা,রূঢ় বাক্য বা পাপ কার্য আমাদের এই জীবনকে বা পরবর্তী জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৩/ ধর্ম-ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যসমূহ

ধর্ম অর্থ হল ন্যায় বা ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্য।এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ব্যক্তি,পরিবার,শ্রেণী-বর্ণের এবং বিশ্বের জন্য যা ভালো।ভালো কর্ম লাভের জন্য ধর্ম মতে জীবন পরিচালনা করতে হবে,অন্যথায় আমাদের কর্ম হবে মন্দ।ধর্ম আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় জীবনকেই প্রভাবিত করে।

৪/মোক্ষম পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি

মোক্ষ অর্থ পুনর্জন্ম বা 'সংসার' চক্র থেকে মুক্তি।সহ হিন্দুর সর্বশেষ লক্ষ্য হল একদিন পুনর্জন্মের চক্রের সমাপ্ত হবে এবং তাকে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে না।এটি যখনই ঘটবে যখন আর কর্ম থাকবে নাযার কারণে ব্যক্তিকে পুনর্জন্ম লাভ করতে হবে অর্থাৎ যখন ভালো বা মন্দ কোন কর্মই থাকবে না।

৫/ বেদে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়নি

যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল হিন্দুদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বেদে পুনর্জন্মের তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া, সমর্থন করা, এমনকি উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি। মৃত্যুর পর আত্মার অন্য দেহে গমনের পুরো ধারণাটাই বেদে অনুপস্থিত।

৬/পুনর্জন্ম অর্থ পুনরায় জন্ম গ্রহণের চক্র নয় বরং মৃত্যুর পরের জীবন

পুনরায় জন্মগ্রহণ বোঝাতে সাধারণত যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হলো পুনর্জন্ম বা পুনর্জন্ম। সংস্কৃত 'পুনঃ' বা 'পুন' অর্থ পরবর্তী বা আবারও এবং জনম বা জন্ম অর্থ জীবন।

সুতরাং পুনর্জন্ম বা পুনর্জন্ম অর্থ হল পরবর্তী জীবন বা মৃত্যুর পরের জীবন। এর অর্থ ছি নয় যে আপনি বারবার জীবনলাভ করে পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

মৃত্যুর পরের জীবনের কথা মাথায় রেখে কেউ যদি হিন্দুধর্মগ্রন্থের যেসব স্থানে পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা অধ্যয়ন করে তাহলে তারা পুনর্জন্ম বা বারবার জীবন লাভ নয় বরং পরবর্তী জীবন সম্পর্কে ধারণাই লাভ করবে।

ভগবদগীতা ও উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে যে পুনর্জন্মের কথা বলা হয়েছে এটা দ্বারা তাই বোঝানো হয়েছে। বেদিক যুগের পর বার বার জন্ম গ্রহণ করা বা পুনরায় জন্মগ্রহণের ধারণাটি গড়ে উঠে। স্রষ্টা অবিচার করতে পারছেন না-এ কথাটি বিবেচনায় রেখে জন্মের সময় মানুষে মানুষে যে পার্থক্য হয় এবং মানুষ যে বিভিন্ন সময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করার জন্য উপনিষদ, ভগবদগীতা ও পুরাণসহ পরবর্তী ধর্মগ্রন্থগুলোতে মানুষ সচেতনভাবেই এই মতকে অন্তর্ভুক্ত করে। ঐ মত অনুযায়ী, যেহেতু আল্লাহ অবিচার করেন না, তাই মানুষে মানুষে বৈষম্য ও ব্যবধানের কারণ তাদের পূর্বজন্মের কাজের ফল। তবে ইসলামেও এর যৌক্তিক জবাব রয়েছে।

৭/ বেদে মৃত্যু পরবর্তী জীবন

বেদে মৃত্যুর পরের জীবনের উল্লেখ রয়েছে।

ক. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ১৬ শ্লোক ৪

"এ মৃত ব্যক্তির যে অংশ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত চিরকালই আছে,হে অগ্নি! তুমি সে অংশকে তোমার তাপ দ্বারা উত্তপ্ত কর,তোমার শিখা সে অংশকে উত্তপ্ত করুক।হে জাতবেদা বহি! তোমার যে সকল শুভকামী লোক আছে তাদের দ্বারা এ মৃত্যুকে পুন্যবান লোকদের ভুবনে নিয়ে যাও।"

সংস্কৃত শব্দ 'সুক্রিতামো লোকাম' অর্থপুন্যবানদের কথা বা পুন্যবানদের অঞ্চল'।এখানে মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলা হয়েছে।

খ. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ১৬ শ্লোক ৫

"(এই মৃত্যু দেহের) যা অবশিষ্ট আছে তা জীবনপ্রাপ্ত হয়ে উল্লিখিত হোক,হে জাতবেদা! সে পুনরায় দেহ লাভ করুক"।

এই শ্লোকেও দ্বিতীয় জীবন তথা মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৮. বেদে স্বর্গের প্রসঙ্গ

স্বর্গের কথা বেদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

ক. অথর্ববেদ বই ৪ স্তবক ৩৪ শ্লোক ৬

"দধি, মধু, ঘৃতাদির দ্বারা পূর্ণ রসের ধারা স্বর্গলোকে মাধুর্যের মত সিঞ্চন করে তোমাকে লাভ করুক। ঘৃতাদি দ্রব্যের মধ্যে যা যা কামনা কর, সেগুলির দ্বারা পূর্ণ হয়ে বহুবিধ পুষ্করিণী তোমার সেবা করুক।

খ. অথর্ববেদ বই ৪ স্তবক ৩৪ শ্লোক ২- এ উল্লেখ আছে, অমৃতময় শরীর, অতীষ্ঠা ৫৫ ভার্গবাতুর দ্বারা পবিত্রীকৃত, নির্মল,দীপ্যমান তারা জ্যোতির্ময় ভুবনে গমন করে।

স্বর্গালোকে এদের ভোগসাধন তাদের জনেন্দ্রিয়কে অগ্নিদগ্ধ করে না। সুখের এই ভুবনে তাদের ভোগের জন্য বহু স্ত্রীলোক আছে।

গ. অথর্ববেদ বই ২ স্তবক ৩৪ শ্লোক ৫- এ উল্লেখ আছে, অন্তরিক্ষলোকে স্থিত দেবগণ সর্বপ্রথম তোমার শরীর থেকে নিষ্কাশিত আত্মাকে গ্রহণ করুক। তারপর তুমি দেবগণের দ্বারা পরিগৃহীত হয়ে স্বর্গালোকে যাও এবং সেখানে দিব্য ভোগযোগ্য শরীরে প্রতিষ্ঠিত হও। আলোকিতদের (পূর্বপুরুষদের) পথ ধরে আলো ও মুক্তির জগতে প্রবেশ করো।
ঘ. অথর্ববেদ বই ৬ স্তবক ১২২ শ্লোক ৫- এ উল্লেখ আছে, তোমরা উভয়ে এই কাজ শুরু করো, একে অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাও।

যাদের অগাধ বিশ্বাস আছে' তারা এই সুখময় আবাসে গমন করবে। আত্মত্যাগের আগুনে তোমরা যে অঞ্জলিই দাও না কেন তোমরা উভয়ে, স্বামী ও স্ত্রী, এগুলো রক্ষার্থে ঐক্যবদ্ধ থাকো।

ঙ. ঋগ্বেদ বই ১০ স্তবক ৯৫ শ্লোক ১৮- এ উল্লেখ আছে,

হে ইলা! এসকল দেবতা তোমাকে বলছেন যেহেতু তুমি অবশ্যই মারা যাবে, সেহেতু তোমার বংশধরগণ যেন স্বকীয় হোমদ্রব্য দ্বারা দেবতাদের তুষ্ট করে, আর তখনই তুমি স্বর্গে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে।

৯. বেদে নরকের প্রসঙ্গ

নরকের কথাও বেদে বর্ণিত হয়েছে এবং নরক বোঝাতে সংস্কৃতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল 'নরকাস্থানম'।

এ বিষয়ে ঋগ্বেদ বই ৪ স্তবক ৫ শ্লোক ৪- তে উল্লেখ আছে।'

"পূজনীয় ও বিদ্বান প্রভুর বিধিবিধান ও আইনকে যারা অবজ্ঞা করে জাজ্বল্যমান তিষ্কদন্ত অগ্নিশিখা সন্তাপকর তেজ দ্বারা তাদেরকে দগ্ধ করুক।"

ইসলামে মৃত্যুর পরের জীবন

১. পৃথিবীতে একবার জন্মলাভ করা এবং তারপর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করা।

কুরআনের ২ নম্বর সূরা বাকারার ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছেঃ

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ,

"তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করিয়াছেন আবার মৃত্যু ঘটাইবেন ও পুনরায় জীবন্ত করিবেন, পরিণামে তাঁহার দিকেই তোমাদিগকে ফিরাইয়া আনা হবে।"

ইসলাম বলে মানুষ কেবল একবারই এ পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে এবং মৃত্যুর পর শেষ বিচারের দিনে তাকে আবারো জীবন্ত করা হয়। তার কাজের ওপর নির্ভর করে হয় সে জান্নাতে বসবাস করবে আর না হয় সে জাহান্নামে যাবে।

২. দুনিয়ার জীবন হচ্ছে আখেরাতের জীবনের জন্য একটি পরীক্ষাক্ষেত্র ।

কুরআনের ৬৭ নম্বর সূরা মুলকের ২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন"তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম;তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

আমরা দুনিয়াতে যে জীবনযাপন করি তা আখেরাতের জীবনের জন্য একটি পরীক্ষা। আমরা যদি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলি এবং এ পরীক্ষায় পাস করি তাহলে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব যেখানে আছে পরম সুখ। আমরা যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তার আদেশ-নিষেধ মেনে না চলি এবং এ পরীক্ষায় পাস করতে না পারি তাহলে আমরা জাহান্নামে নিপতিত হব।

৩. শেষ বিচারের দিনে কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে।

কুরআনের ৩ নম্বর সূরা আল ইমরানের ১৮৫ আয়াতে বলা হয়েছে:

1 كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ۙ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ
عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.

প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে"কিয়ামতের দিন তোমাদিগকে তোমাদিগের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেওয়া হইবে যাহাকে অগ্নি হইতে দূরে রাখা হইবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হইবে সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।"

৪. বেহেশত - আল জান্নাত

ক. আল জান্নাত অর্থাৎ বেহেশত রা স্বর্গ পরম সুখের জায়গা। আরবিতে 'জান্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'বাগান'। কুরআনে জান্নাতের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে, যেমন বাগান যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। এতে দুধ ও খাঁটি মধুর নদী রয়েছে যার স্বাদ-গন্ধ অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে। জান্নাতে সব ধরনের ফল রয়েছে। সেখানে কেউ কখনো ক্লান্ত বা অবসাদগ্রস্ত হবে না, অলস কথাবার্তাও বলবে না কেউ। সেখানে পাপ করার, সমস্যায়, উদ্বেগে, বিপদে বা দুঃখকষ্টে পড়ার কোন কারণ থাকবে না। জান্নাতে কেবল থাকবে শান্তি আর পরম সুখ।

খ. কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে জান্নাতের বর্ণনা দেয়া আছে, যেমন:

১. আল কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৫ নং আয়াত

২. আল কুরআনের ৩ নং সূরা আলে ইমরানের ১৯৮ নং আয়াত

৩. আল কুরআনের ৪ নং সূরা নিসার ৫৭ নং আয়াত

৪. আল কুরআনের ৫ নং সূরা মায়েদার ১১৯ নং আয়াত

৫. আল কুরআনের ৯ নং সূরা তওবার ৭২ নং আয়াত

৬. আল কুরআনের ১৫ নং সূরা হিজরের ৪৫-৪৮ নং আয়াত

৭. আল কুরআনের ১৮ নং সূরা কাফের ৩১ নং আয়াত

৮. আল কুরআনের ২২ নং সূরা হজ্জের ২৩ নং আয়াত ৯. আল কুরআনে পৃষ্ঠা ৫৪ ডিবে ৩৩৮১ নং আয়াত ১০. আল কুরআনের ৩৬ নং সূরা ইয়াসিনের ৫৫-৫৮ নং আয়াত

মুসলিমরা কি কা'বা ঘরকে সেজদাহ করে?

ইবাদত করতে আমাদের কোনো প্রকার মূর্তির প্রয়োজন হয় না। এছাড়াও বলা দরকার, শ্রী শ্রী রবিশংকর তার বইতে লিখেছেন ৪নং পৃষ্ঠায়, ইসলাম কঠোরভাবে বিশ্বাস করে একজন নিরাকার সৃষ্টিকর্তাকে। তারপরেও তারা মনে করে সৃষ্টিকর্তার প্রতীক হলো মক্কা শহরের 'কাবা শরীফ'। যদিও তারা বিশ্বাস করে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজমান কিন্তু তারা ইবাদত করে কাবার দিকে মুখ করে। তিনি তারপরে লিখেছেন তাঁরা মুসলমানরা নিরাকারের ইবাদত করছে আকারের মধ্যদিয়ে। যদি কেউ বলে যে, মুসলমানরা আল্লাহর ইবাদত করে কাবাকে পূজা করার মাধ্যমে, হিন্দুধর্ম ও ইসলাম -

৩

সেটা সম্পূর্ণ ভুল হবে। এমন কথা উল্লেখ নেই ইসলামের কোনো গ্রন্থে, কোনো বিধানে। কোনো মুসলমান কখনো 'কাবা'কে পূজা করে না, এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা কুরআন মজীদে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন সূরা আল-বাকারার ১৪৪ নং আয়াতে এভাবে-

فَلَوْلَيْتُكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا . فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .

অর্থ: "তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি যা তুমি পছন্দ কর, অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।"

কাবার দিকে ফিরে মানে মুখ করে। 'কাবা' হলো আমাদের কিবলা, নির্দেশিত দিক। আর আমরা একথা বিশ্বাস করি। যখন সবাই একসাথে নামাজ পড়ে, তাহলে কোনো দিকে ফিরে পড়বে? উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম কোন দিকে? তাই একথার জন্যে একদিকে ফিরে নামাজ পড়ি। সেটা হলো কাবা শরীফের দিকে, আর এটাই হলো মুসলমানদের কিবলা। যখন মুসলমানরা পৃথিবীর মানচিত্র ঐঁকেছিল, প্রথম ঐঁকেছিলেন আলী দুরসী ১১৫৪ সালে। তিনি ঐঁকেছিলেন দক্ষিণ মেরু উপরে উত্তর মেরু নিচে। আর কাবা একেবারে সেন্টারে। পরবর্তীতে পশ্চিমারা মানচিত্র আঁকতে শুরু করে, তাঁরা মানচিত্রটাকে উল্টে দেয়। উত্তর মেরু উপরে দক্ষিণ মেরু নিচে।

তারপরও কাবা সেন্টারেই থাকল। তাহলে দেখুন আপনি উত্তরে থাকেন তাহলে উত্তরে ফিরবেন আর দক্ষিণে থাকেন তাহলে উত্তরে ফিরবেন। পূর্বে থাকলে পশ্চিমে, পশ্চিমে থাকলে পূর্বে ফিরবেন। আমরা মক্কায় গিয়ে যখন কাবার চারপাশ প্রদক্ষিণ করি, ওমরাহ ও হজের সময় এটা আমরা করি আল্লাহর আদেশে। তবে যুক্তি দিয়ে বলি, আমরা প্রদক্ষিণ করি এই জন্যে যে, প্রত্যেক বৃত্তের একটি কেন্দ্র আছে। এখানে বুঝানো হচ্ছে যে, আল্লাহ কেবল একজনই। তাই যদি কেউ বলে আমরা নিরাকারের উপাসনা করি আকারের মধ্যদিয়ে, ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা একেবারেই ভুল, না হয় অমূলক।

শ্রী শ্রী রবিশংকর তার বইয়ের ২৬ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুহাম্মদ যখন মক্কায় ফিরে আসেন তখন তিনি কাবার সব মূর্তি ধ্বংস করেছিলেন।

তবে মূর্তি পূজার প্রধান জিনিসটা বাদে 'কালো পাথর' অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি 'হাজারে আসওয়াদ'। যদি কেউ বলে কালোপাথর মূর্তি পূজার প্রধান বস্তু তাহলে সে অত্যন্ত ভুল বলে। এটা কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়। এর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ কোথাও পাবে না। শুধু ইসলামের ধর্মগ্রন্থেই নয়, কোনো সময় কোনো কালে 'হাজারে আসওয়াদ'-কে কেউ পূজা করেছিল। আরব্য সমাজে কখনো এমনটা হয় নি। কেউ করেনি এটাই বাস্তব কথা।

১১. আল কুরআনের ৩৭ নং সূরা আস-সাফাতের ৪১-৪৯ নং আয়াত

হিন্দুধর্মের জাতিভেদ প্রথা

ইসলাম ধর্মের ভিত্তি হলো কিছু ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ভিত্তি হলো যাত-পাতের ওপর।

হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন মত, পথ এবং জাতি-গোষ্ঠী আছে। সকলের মধ্যে প্রযোজ্য একটি স্বাধীন প্রথা বা সিস্টেম হলো জাতিভেদ প্রথা। সকল হিন্দু চারটি প্রধান জাতিতে বিভক্ত। এগুলো হলো- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কিন্তু চার বর্ণের ব্রাহ্মণ্য প্রথাটি হিন্দুর বিশ্বাসে এখনও দৃঢ়মূল। এই দৃঢ়মূল ভিত্তির বদৌলতে হিন্দু এখন প্রধান প্রধান ৪৬৩৫টি জাতিগত উপজাতিতে বিভক্ত। উল্লেখ্য এই ৪৬৩৫টি জাত উপজাত উপর থেকে নিচে (পীরামীড) এই ক্রমে স্থরে স্থরে সাজানো। একটি অপরটি থেকে পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা। এক জাতের সাথে আরেক জাতের বৈবাহিক বা সামাজিক কোন সম্পর্ক নেই। তাদের রয়েছে যার যার সমাজ রীতি-নীতি। সংস্কার বা কুসংস্কার। সামাজিক গতিশীলতার পথ এখানে রুদ্ধ। কারণ অর্থ বিদ্যা এবং কক্ষমতা এর কোন টাই সাধারণ ভাবে এক জাতির লোকদের অপর জাতিতে উন্নীত করতে পারে না। ব্যবস্থাটি জন্মগত ও বংশগত হওয়ায় একজনের জন্ম যে জাতে তার মৃত্যুও হয় সেই জাতে।^৩

-আদয়ানুল হিন্দ, পৃ- ৫২১ সিন্ধু থেকে হিন্দু-১৩

কখন থেকে জাতিভেদ প্রথা শুরু

বাঙ্গালী হিন্দুর সামাজিক ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় যে, এই জন্মগত জাতিভেদ প্রথাটির বয়স সর্বোচ্চ সাত-আটশত বছর। কীভাবে এই প্রথাটির উদ্ভব হয়েছে তার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন ড. গুর তার গ্রন্থে বাংলার সামাজিক বিবর্তনের যে চরিত্র তুলে ধরেছেন। তাতে দেখা যায় প্রাক পাল যুগে (প্রায় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলার চার বর্ণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কোন সমাজ ছিল না। কারণ প্রাক পাল যুগে স্থানীয়দের মধ্যে জন্মগত কোন জাতিভেদ ছিল না। অর্থাৎ সমাজটি ছিল জাতপাতহীন একটি সমতল সমাজ।

নবম দশম শতাব্দীর দিকেই ব্রাহ্মণরা জাতিভেদ প্রথার বীজ রোপন করে। তারা সুযোগ বুঝে চার বর্ণের আদলে সমাজকে বিভক্ত করার- উদ্দেশ্য নেয়। বলাহয়, ব্রাহ্মণ বাদে বাংলার সকল মানুষই সংকর এবং শূদ্র। কেবল মাত্র ব্রাহ্মণই নির্ভেজাল। এ প্রেক্ষাপটে সরকারি কর্মচারিরা নিজেদেরকে কায়স্থ হিসাবে গণ্য করতে শুরু করে। দেখাদেখি কৈবর্ত্য ইত্যাদি জাতিরও নিজেদেরকে সতন্ত্রভাবে শুরু করে। কিন্তু এই দাবিগুলো কোন আনুষ্ঠানিক লাভ করে নি। পাল যুগের শেষে আসে সেন রাজত্ব। একাদশ শতকে বলল সেনের সমসাময়িক কালে রাচিত বৃহদ্ধর্ম পুরানেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে বাঙালি হিন্দুর জাতি বিন্যাস। এই বৃহদ্ধর্মপুরানে দিয়ে আরম্ভ করে পরবর্তীকালে সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে হিন্দুর জাতি বিন্যাস বারবার পরিবর্তিত হয়। নিম্নে প্রধান চার জাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণগণ হলেন হিন্দু সমাজে সর্বোচ্চ স্থরের জাতি রাষ্ট্র ও সমাজের রক্ষক ও পালক একমাত্র তারাই। পূজা, অর্চনা, আরাধনায় পৌরহিত্য করতে পারেন। অপর সকল হিন্দু জাতের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা তাঁদের প্রাপ্য। পূজার সময় একমাত্র পুরোহিত দেবতা সন্নিধ্যানে থাকতে পারেন। তাই মন্দিরের আকার মসজিদের মতো প্রশস্ত বা বৃহৎ নয়। এরা হলো আর্ষদের যারা যুদ্ধে নেতৃত্বদিয়ে ছিল বা রাজা ছিল। তাদের দায়িত্ব কম অধিকার বেশী। বাকী জাতের লোকেরা তাদের খেদমত করবে। হিন্দুদের বিশ্বাস ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম বা সৃষ্টি। তাই তার মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। ০

• - হিন্দু থেকে হিন্দু-১৩৬-১৩৭ *-সিন্ধু থেকে হিন্দু-১১১

ক্ষত্রিয়

ক্ষত্রিয়গণ হলেন যোদ্ধার জাত রাষ্ট্র ও সমাজের রক্ষক। তারা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং রাজ্যের শাসন দায়িত্বে থাকবেন। রাজা হলে বংশানুক্রমে অথবা সামরিক শক্তি বলে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারেন। এরা হলো তারাই যারা আর্ষদের সাথে যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করতে এসেছিল। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস হলো ক্ষত্রিয়দের সৃষ্টি হলো ব্রহ্মার বাহু থেকে। তাই তারা শক্তিশালী ও যুদ্ধা। ০

বৈশ্য

বৈশ্যগণ হলেন ব্যবসায়ী শ্রেণী, কৃষি-ব্যবসা দ্বারা সমাজের ধন-সম্পদের উৎপাদক ও পালক। তাদের কাজ হলো দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কল- কারখানা ইত্যাদির মালিক হওয়া এবং পরিচালনা করা। এরা ছিল তারা দ্রাবিড়দের মধ্যে যারা আর্ষদের সমর্থন করেছিল। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস হলো- ব্রহ্মার উরু থেকে বৈশ্য এর সৃষ্টি। ০ ০

শূদ্র

শূদ্রগণ হলেন সেবক শ্রেণী; পরিশ্রমের দ্বারা সমাজের সেবক ও পোষক। তাদের কাজ হলো উপরিউক্ত তিনশ্রেণীর সেবা করা, তাদের চাকরগিরী করা। এরা ছিল হিন্দুস্তানে দ্রাবিড়দের মধ্যে যারা আর্যদের বিরোধিতা করে ছিল। এরা সবচেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। ক্ষত্রিয়গণের যদি তাদের ছায়ায় পা পড়ে যায় বা তাদের স্পর্শ লাগে তাহলে তারা নাপাক হয়ে যায়। কোন পূজা-অর্চনা করা বা কোন অনুষ্ঠানে বা মন্দিরে যাবার তাদের কোন অধিকার নেই। তারা সবচেয়ে নির্যাতিত ও নিপিড়ীত। এদের দায়িত্ব বেশী, অধিকার কম। হিন্দুধর্মের বিশ্বাস- শূদ্রের সৃষ্টি হলো ব্রহ্মার পা থেকে। তাই তারা পায়ের জাত, নিচু জাত।

ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব

হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান কেবল অন্যান্য জাতের ওপরেই নয়, বরং ব্রাহ্মার মুখ থেকে সৃষ্ট হওয়ার কারণে সে সৃষ্টির প্রভু। সে বেদ ধারণ করবে।

*- সিন্ধু থেকে হিন্দু-১১১ট *

-সিন্ধু থেকে হিন্দু-১১১

০-সিন্ধু থেকে হিন্দু-১১১

-আল আদয়ান ফিল হিন্দ, পৃ-৫২১, অশোক কুমার লিখিত হিন্দুধর্ম, পৃ-১৯

কারণ ধর্মের জন্যই তার জন্ম। পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ, সবই ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য সবকিছু সে একাই পাওয়ার যোগ্য। সে যা খায়, যা পরিধান করে, সবই তার নিজের। কারণ, সবকিছুতেই তার একচ্ছত্র অধিকার। অন্যেরা যা ভোগ করে, তার মূলে রয়েছে ব্রাহ্মণের দয়া। ব্রাহ্মণেরা অধিকার দিয়েছে বলেই তারা সেটুকু ভোগ করতে পারছে।

ব্রাহ্মণ মূর্খ হলেও তাতে অসুবিধার কোন কারণ নেই। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, অগ্নি দেখা যাক বা না যাক, তা মহাদেবতা। তেমনি ব্রাহ্মণ বিদ্যান হোক বা না হোক, সে সব সময় মহাদেবতা। শ্মশানের অগ্নি যেমন দূষিত হয় না, তেমনি সমুদয় কুৎসিত কাজে লিপ্ত থাকলেও ব্রাহ্মণ সদা পূজনীয়, সব মানুষের পরমদেবতা। কেবল জন্মের দাবিতেই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মের দ্বারাই সে দেবতাদের দেবতা। তার উপদেশই লোকের কাছে প্রমাণ্য। কারণ, তা হলো দেবভিত্তিক।

অধ্যয়ন (বেদের চর্চা)। অধ্যাপন (বেদজ্ঞান দান করা), যাজন (পৌরহিত্য) এবং প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ) এ সবার অধিকার কেবল ব্রাহ্মণের। বেদ পাঠ করার অধিকার অন্য দুই বর্ণের দ্বিজদের আছে, তবে বিদ্যাদানের অধিকার তাদের নেই। শূদ্রের জ্ঞান লাভের কোন অধিকার নেই। কোন ব্রাহ্মণ তাকে বেদের জ্ঞান দান করলে সে ব্রাহ্মণ এক বছর যাবতকারী হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে ব্রাহ্মণকে বিবাহের বেলায়ও কিছুটা বাড়তি সুবিধা দেয়া হয়েছে। হিন্দু সমাজে বিবাহ রীতি আটটি ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ। এ সব রীতির মধ্যে প্রথম ছ'টি দ্বারা ব্রাহ্মণ পুরুষ স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে, ক্ষত্রিয় কেবল চারটি এবং বৈশ্য ও শূদ্র মাত্র তিনটি রীতি গ্রহণ করতে পারে।

ব্রাহ্মণকে সমাজস্বীকৃত ছ'টি বিবাহ রীতি ব্যবহারের সুযোগ দেয়াতে সে যে কোন সময় নিজের পছন্দমতো স্ত্রী সংগ্রহ করতে পারে। এসব রীতিতে পিতা পাত্রকে কণ্যা দান করতে পারে, পাত্র-পাত্রী নিজেরাই একে অপরকে পছন্দ করতে পারে, কিংবা পাত্রীর অমতেই পুরুষ বলপূর্বক হরণ কিংবা ধর্ষণ করে তাকে অধিগত করতে পারে। ফলে যাদের ক্ষেত্রে যতগুলো বেশি রীতি প্রযুক্ত, স্ত্রীরত্নের ভাণ্ডারটি তাদের ততই সমৃদ্ধ হয়ে পাবার সুযোগ।

মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণদের জন্য কায়িক পরিশ্রম না করেই অনায়াসে বিলাসী জীবনযাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ধনদান করলে দাতা স্বর্গে স্থান পাবে। ব্রাহ্মণদের কাজও সহজ: যাজন (পৌরহিত্য), অধ্যাপনা (দেবজ্ঞান দান) এবং প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ বা ভিক্ষাবৃত্তি) ব্রাহ্মণকে কেবল অন্নই নয় তার সাথে দক্ষিণাও দিতে হবে। ধনরত্ন, ভোজ্য ও দক্ষিণা দেবার উপদেশ রাজাকেও দেয়া হয়েছে। আবার তাকে ভিক্ষায় নারীও দেয়া যেতে পারে।

ব্রাহ্মণদের ব্যাপারে রাজাদের জন্য রয়েছে বিশেষ নির্দেশ। বলা হয়েছে- রাজা ব্রাহ্মণদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন, তিনি ব্রাহ্মণদের সেবা করবেন, তাদের আদেশ মেনে চলবেন, ইত্যাদি। রাজা কোন অবস্থায়ই এমন কাজ করবেন না যা ব্রাহ্মণের ক্রোধের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

বিচারব্যবস্থায়ও ব্রাহ্মণদের জন্য রয়েছে অনেকটা বাড়তি সুবিধা। অন্য ত্রিবর্ণের সাক্ষীকে নানা ধরনের মানসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ সাক্ষীকে কিন্তু কেবল অনুরোধ করা যাবে, আপনি কী জানেন, তা বলুন। ব্রাহ্মণের যে কোন অপরাধে সর্বোচ্চ সাজা হতে পারে তার ধনরত্নসহ অক্ষত দেহে নির্বাসন দেয়া। ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের কিছু শ্লোকের বিবরণ দেওয়া হলো-

ক. স্রষ্টা ব্রাহ্মণদেরকে মুখ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

খ. স্থাবর-জমির মধ্যে প্রাণী শ্রেষ্ঠ প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধিজীবীরা শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিমানদের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ আর মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ।

গ. পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। শ্রেষ্ঠত্ব অভিজাত

হেতু ব্রাহ্মণ সবই পাওয়ার যোগ্য ইত্যাদি।

শূদ্রের নীচতা

শূদ্র (দাস) সম্প্রদায়ের স্থান সমাজের সর্ব নীচের ধাপে। কারণ তাদের জন্ম স্রষ্টার পা থেকে। স্রষ্টা তার জন্য মাত্র একটি কাজ নির্দিষ্ট করেছেন আর তা হলো অন্য ত্রিবর্ণের লোকদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের সেবা করা। অন্যান্য বর্ণের লোকেরা যেসব পথে স্বর্গে যেতে পারে শূদ্রের জন্য তা খোলা নেই। তার জন্য স্বর্গলাভ করার একমাত্র পথ দেবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ ও কীর্তিমান ব্রাহ্মণদের সেবা করা।

জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই শূদ্রকে ছোট করে দেখার নির্দেশ শাস্ত্রে রয়েছে। ব্রাহ্মণদের জন্য শুভসূচক নামকরণের কথা বলা হয়েছে, অথচ শূদ্রের জন্য বলা হয়েছে নিন্দাবাচক নাম ও দাসবাচক উপনাম রাখতে।

বিবাহের যে বিধান হিন্দুশাস্ত্রে রয়েছে, শূদ্রের জন্য তা-ও বৈষম্যমূলক। পূর্বে উল্লিখিত আট ধরনের বিবাহের মধ্যে যেসব পদ্ধতি ব্রাহ্মণদের জন্য অশুভ বলা হয়েছে, শূদ্রের জন্য সেগুলোই করণীয় হিসেবে নির্দেশ রয়েছে। উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের কন্যা বিবাহ করতে পারে, কিন্তু তার উল্টোটা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ।^{১০}

০ মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায় ৩১নং সিন্ধু থেকে হিন্দু-১১২

হিন্দুশাস্ত্রে যে বিচারব্যবস্থা রয়েছে শূদ্রের জন্য তা কেবল বৈষম্যমূলক নয়, নিপীড়নমূলকও। শূদ্র যে অপরাধই করুক না কেন, তার সাজা সব সময়ই চরম। সে কোন ব্রাহ্মণকে চোর বলে গালি দিলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আবার ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকে একই গালি দেয় তবে তার দণ্ড মাত্র বারো পণ। তার মানে, যে অপরাধের জন্য একপক্ষের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, সেই একই অপরাধ করলে অপর পক্ষের জরিমানা করা হবে মাত্র বারো পণ। যদি কোন শূদ্র পাপবাচক শব্দ উচ্চারণ করে কৰ্কশভাবে কোন দ্বিজকে গালি দেয়, তবে তার জিহ্বা কেটে ফেলতে হবে। যদি সে নাম বা জাতি উল্লেখ করে দ্বিজকে গালি দেয়, তবে তার মুখের মধ্যে দশ আঙ্গুল লম্বা জ্বলন্ত লৌহশলাকা ঢুকিয়ে দিতে

হবে। কোন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয় তবে তার মুখে ও কানে উত্তপ্ত তেল ঢেলে দিতে হবে। একটু সাহস করে যদি সে ব্রাহ্মণের সঙ্গে একই আসনে বসতে চায় তবে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা কটিদেশ পুড়িয়ে দিয়ে তাকে নির্বাসন দেয়া হবে। যদি সে ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে বা তাকে শরীরিকভাবে কষ্ট দেয় তবে নাক-কান কেটে তাকে কষ্টদায়কভাবে হত্যা করতে হবে। নিম্নবর্ণের কোন লোক যদি উচ্চবর্ণের কোন নারীকে ধর্ষণ করে তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তবে কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য শূদ্রকন্যাকে ধর্ষণ করলে তার দণ্ড হবে মাত্র সহস্রপণ আর ব্রাহ্মণের বেলায় তা হবে মাত্র পাঁচশ পণ। এভাবে জাতগত পার্থক্যের কারণে একই অপরাধের শাস্তিও ভিন্ন

হয়। শূদ্রকে কোন অবস্থায়ই ধর্মীয় উপদেশ দেয়া যাবে না। এমন অপরাধ যে করবে, সে অসংবৃত নামক নরকে নিষ্কিণ্ত হবে।

প্রায়শ্চিত্তের বেলায় শূদ্রকে বিড়াল কুকুর, নেউল, কাক, পেঁচা, ব্যাঙ প্রভৃতির সমতুল্য করা হয়েছে। উচ্চবর্ণের কোন লোক এসব ইতর প্রাণীকে বধ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, শূদ্র হত্যার বেলায়ও তা করার বিধান রয়েছে।

শূদ্র যেহেতু অপবিত্র, কাজেই সে ব্রাহ্মণদের থেকে দূরে থাকে। সে প্রতিমাসে একবার চুল কাটাবে, যাতে সহজেই তাকে চিনা যায়। এর কারণ, ব্রাহ্মণরা যাতে সবসময় নিজেরদের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তার থেকে দূরে থাকতে পারে, তা নিশ্চিত করা। মৃত্যুর পরও শূদ্রের শূদ্রত্ব বহাল থাকবে। ব্রাহ্মণের মৃতদেহকে নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু শূদ্রকে নিতে হয় দক্ষিণ দ্বার দিয়ে।

দেখাযাক, মনু শূদ্রদের সম্পর্কে কী বলে?

১. শূদ্রদের বা দাসদের নিজস্ব কোন সম্পত্তি রাখার অধিকার নেই।

দাস ও শূদ্রদের ধর্ম ব্রাহ্মণ অবাধে নিজের কাজে প্রয়োগ করবে।

২. শূদ্র অর্থসঞ্চয় করতে পারবে না। কারণ তার সম্পদ থাকলে সে গর্বভরে ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার করতে পারে।

৩. প্রভুর উচ্ছিষ্ট তা ভক্ষ্য।

৪. দাস বৃত্তি থেকে শূদ্রের কোন মুক্তি নেই।

৫. যজ্ঞের কোন দ্রব্য শূদ্র পাবে না।

৬. যে পথে উচ্চ বর্ণের লোকেরা যাতায়াত করে সে পথে মৃত শূদ্রদেরও বহন করা যাবে না।

দলিতদের অস্পৃশ্যতা

উপরে উল্লিখিত চারটি জাত ছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে আরেকটি জাত। এরা অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। এদের অবস্থান চতুবর্ণের বাইরে। এরা হলেন হিন্দু বর্ণবাদের সবচেয়ে নির্মম শিকার। কারণ সামাজিকভাবে তারা শূদ্রের চেয়ে অধম ও নিকৃষ্ট। হিন্দু মূলধারা থেকে তারা এত বিচ্ছিন্ন যে, জনসাধারণের ব্যবহার্য কুয়া ও পুকুর থেকে পানি নেয়া, সাধারণ পথে চলাফেরা করা বা সর্বজন ব্যবহার্য পার্কে বসা বা রেস্টুরেন্টে পানাহার করা, চতুবর্ণের লোকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা, এসব অধিকার তাদের নেই। এদের স্থানও গ্রামের বাইরে। এদের সম্পদ বলতে থাকবে গাধা ও কুকুর। এরা পরিধান করবে মৃতব্যক্তির দেহ থেকে ফেলে দেয়া বস্ত্র আর আহার করবে ভাঙা বাসনে। লোহার অলংকার পরে এরা নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাবে।

হিন্দু সমাজে অচ্ছুৎ (?) বা দলিত সম্প্রদায়ের লোককে এত বেশি অপবিত্র মনে করা হয় যে, এদের স্পর্শ, এমনকি ছায়াও অন্যান্য জাতের লোককে ধর্মচ্যুত করে দেয়। এজন্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে কড়া নির্দেশ রয়েছে অচ্ছুৎ দলিতগণ বর্ণহিন্দুদের থেকে দূরে থাকবে। তাদের আর্থিক লেনদেন এবং বিবাহ হবে নিজেদের মধ্যে। রাতের বেলা তারা গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করতে পারবে না, দিনের বেলায় তারা কাজের জন্য গ্রামে বা নগরে ঢুকতে পারবে, তবে এ সময় তারা বিশেষ চিহ্ন ধারণ করবে যাতে দূর থেকে দেখলেই তাদেরকে চেনা যায়। ভারতের মোট লোক সংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ হচ্ছে দলিত, যারা বর্ণ হিন্দুদের দৃষ্টিতে অস্পৃশ্য হাজারো বছর থেকে তারা রয়েছেন মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। মূর্থ হওয়ার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করা হয়, অথচ একই

সময় তাদের জন্য শিক্ষার দ্বার বন্ধ রাখা হয়। নিজেদের জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নেয়া বা সর্বসাধারণের সুযোগ সুবিধা ভোগ করার অধিকার তাদের নেই। মুচী, ঝাড়ুদার, চণ্ডাল প্রভৃতি পেশার লোকই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এদের কাজের মধ্যে আরো রয়েছে লাওয়ারিশ মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া, দণ্ডিত লোকদের হত্যা করে বিনিময়ে মৃত ব্যক্তির বস্ত্র, শয্যা ও অলংকার নেয়া, মৃত পশুর চামড়া খোসানো ইত্যাদি।^০

বৃটিশ সরকার অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য হিসেবে পরিচিত এ জনগোষ্ঠীর নাম দিয়েছিল তফসিলি সম্প্রদায়। গান্ধী তাদের নাম দিয়েছিলেন 'হরিজন'। হরিজন মানে 'ঈশ্বরের সন্তান' হলেও শব্দটি জারজ সন্তান অর্থে ব্যবহৃত হয়। কারণ, হিন্দু মন্দিরে দেবদাসী নামক যেসব মহিলা বেশ্যাবৃত্তির কাজে নিয়োজিত থাকত, তাদের সন্তাদেরও বলা হতো হরিজন। তাই গান্ধীর দেয়া হরিজন নামটি বর্জন করে তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য নাম রেখেছে দলিত। দলিত মানে নিপীড়িত।

০ সিন্ধু থেকে হিন্দু-১১১-১১২

দাওয়াহ দেওয়ার পদ্ধতি:

আব্দুল্লাহ: আসসালামু আলাইকুম আ'লা বানিত্তাবাল হুদা,দাদা।কেমন আছেন?

মহেশ: ওয়া আলাইকুম ঈশ্বরের কৃপায় ভালো আছি ভাই।আপনি কেমন আছেন?

আব্দুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ।দাদা, অবতার কী?

মহেশ: ঈশ্বর বলেন,,,

"যেখানেই ন্যায়ের অবক্ষয় দেখা দেয়,হে ভারত, এবং অন্যায় অবিচার বেড়ে যায়,তখনই আমি নিজেকে প্রকাশ করি।শিষ্টের পালন, দুষ্টির দমন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি প্রত্যেক যুগেই জন্ম গ্রহণ করি"¹

ভাই,যখন সমাজে বিশৃঙ্খলা অন্যায় ,অবিচার বেড়ে যায় তখনই সমাজ সংস্কারের জন্য ঈশ্বর মানুষের রূপ নিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসেন।

আব্দুল্লাহ: দাদা,তাহলে অবতার কি মানুষ?

মহেশ: হ্যা ভাই।ঈশ্বরই মানুষ রূপে নেমে আসেন।

আব্দুল্লাহ:দাদা,ঈশ্বরের মানুষ রূপ নিয়ে নেমে আসার কি দরকার? তিনি কি তার সৃষ্টি সম্পর্কে জানেন না?

মহেশ: ভাই বিষয়টা হলো, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এতো শুদ্ধ ও পূত-পবিত্র যে তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট, সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, অনুভূতি সম্পর্কে জানেন না। তিনি জানেন না যখন কোন মানুষ আঘাত পায় বা বিপদে পরে তখন সে কেমন অনুভব করে।তাই মানুষের আচার আচরণ ও কাজকর্মের নির্দেশিকা তৈরির জন্য মানুষরূপে পৃথিবীতে নেমে আসেন।

আব্দুল্লাহ: দাদা,এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তার নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত না হয়েই তাদের সৃষ্টি করেছেন?

মানে ধরেন, আপনি একটা টেপরেকর্ডার বানালেন। এখন এই টেপরেকর্ডারের জন্য কোনটি ভালো কোনটি খারাপ সেটা জানতে আপনাকে টেপরেকর্ডার হতে হবে?

বরং আপনিই তো সব থেকে ভালো জানবেন এই টেপরেকর্ডার সম্পর্কে,যেহেতু আপনি নিজে এটি তৈরি করেছেন।

এখন ব্যবহারকারীর জন্য আপনি একটা নির্দেশিকা লিখতে পারেন কিভাবে ব্যবহার করলে টেপরেকর্ডার ভালো থাকবে।

আর মানুষের জন্য এই নির্দেশিকা হলো ধর্মগ্রন্থ। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নির্দেশিকা হলো 'কুরআন মাজিদ'।²

মহেশ: তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, ঈশ্বর মানুষরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করেন না? তাহলে আপনি যে নির্দেশিকার কথা বললেন সেটা মানুষ পাবে কিভাবে?

আব্দুল্লাহ: আল্লাহর মনোনীত বান্দা যাকে নবী বা দূত বলা হয়। নির্দেশিকা লেখার জন্য স্বয়ং আল্লাহকেই পৃথিবীতে আসতে হবে না।যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন,তার নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। মানবজাতির জন্য তার কেবল 'ব্যবহার নির্দেশিকা' প্রদান করা প্রয়োজন।আর এর জন্য তিনি মানবজাতির মধ্যে থেকে একজনকে নির্বাচন করে, ওহীর মাধ্যমে তার সাথে উচ্চতর যোগাযোগ করেন।আর এই নির্বাচিত ব্যক্তিই হলেন আল্লাহর বাণী প্রচারক বা নবী।³

মহেশ:তাহলে ঈশ্বর নেমে আসেন না?

আব্দুল্লাহ: না। আপনাদের পবিত্র গ্রন্থ বেদেও অবতার কথাটির উল্লেখ নাই।⁴

আপনিই বলেন, ঈশ্বরের নিজেকেই আসার প্রয়োজনীয়তা কী?

মহেশ: ভাই,আপনি তো ঠিকই বলেছেন।আমি এই সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব।

রেফারেন্স:

(1)ভগবদগীতা অধ্যায় ৪ শ্লোক ৭-৮

(^{2,3,4}) বই-ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য (পৃ.নং:৪১,৪২,৪৩,৪৪)

আব্দুল্লাহ: আসসালামু আলাইকুম আ'লা বানিত্তাবা আ'ল হুদা।দাদা, কেমন আছেন?

মহেশ: ওয়া আলাইকুম আরেহ! আব্দুল্লাহ ভাই যে, আপনি কেমন আছেন?

আব্দুল্লাহ: আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি দাদা।তবে আপনাকে চিন্তিত লাগছে।

মহেশ: ভাই, সমাজের কি অবস্থা! ভাবছি কল্কি অবতার কবে আসবেন।সমাজের সংস্কার করবেন!

আব্দুল্লাহ: দাদা, কল্কি অবতার তো এসেছিলেন,আবার চলেও গিয়েছেন।

মহেশ: কি বলেন ভাই? তিনি কবে আসলেন?

আব্দুল্লাহ: শ্রীমদভাগবত মহাপুরাণ ১২ স্কন্ধ,২ অঃ ১৯ মন্ত্র...

"অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ

অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ"

এখানে বলা হয়েছে" কল্কি অবতার অশ্বের উপর আসীন হয়ে তরবারি হস্তে দুষ্টের দমন করবেন"।

বলেন দাদা, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের যুগ কি এখন আছে? এই যুগ আরো আগেই তো গত হয়েছে।এখন কিসের যুগ দাদা?

মহেশ: তা ঠিক।এখন তো বিমানের যুগ,ট্যাঙ্কের যুগ।

আব্দুল্লাহ: দাদা, এই কল্কি অবতারই হলেন আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:)।

মহেশ: তা কিভাবে ভাই?

আব্দুল্লাহ: ঋগ্বেদে আছে,

কক্কি অবতারের নাম হলো 'নরাশংস'¹ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা। যার বাংলা অর্থ 'মানব প্রশংসিত' এবং আরবি অর্থ হলো মুহাম্মদ। আর আমাদের শেষ নবীর নাম ছিল মুহাম্মদ (সা:)।

কক্কি অবতারের মায়ের নাম 'সুমাতি'² সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা অর্থ 'নিরাপদ-শান্তি' আর এর আরবি অর্থ হলো 'আমেনা'।

আমেনা কার নাম দাদা? 'আমেনা' হলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) এর মায়ের নাম।

কক্কি অবতারে পিতার নাম হলো 'বিষ্ণু যশা'³ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা। যার বাংলা অর্থ 'মালিকের দাস' এবং আরবি অর্থ হয় 'আব্দুল্লাহ'। আর আব্দুল্লাহ ছিলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) এর পিতার নাম।

কক্কি অবতারের জন্মস্থানের কথা বলা হয়েছে যে, তিনি 'শম্ভল'⁴ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন। শম্ভল সংস্কৃত শব্দ যার বাংলা অর্থ 'শান্তির স্থান' আর আরবিতে কি হয় দাদা? আরবিতে হয় মক্কা। শেষ নবী মুহাম্মদ (সা:) মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনিই তো অশ্বের উপর আসীন হয়ে তরবারি হাতে দুষ্টির দমন করেছেন।

মহেশ: ভাই, তাহলে মুহাম্মদ (সা:) কি আমাদেরও নবী? তিনি তো মুসলিমদের নবী?

আব্দুল্লাহ: দাদা, কুরআনে সূরা সাবার ২৮ নং আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন, "এবং (হে নবী) আমি তোমাকে সমস্ত মানুষের জন্য একজন সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপেই পাঠিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বুঝছে না।"

বলেন দাদা, এখানে আল্লাহপাক কি বলেছেন মুহাম্মদ (সা:) শুধু মুসলিমদের নবী? আল্লাহ বলেছেন মুহাম্মদ (সা:) সমগ্র মানব জাতির নবী।

দাদা, আপনি মানবজাতির বাইরে নাকি?

মহেশ: বুঝতে পেরেছি আব্দুল্লাহ ভাই। মুহাম্মদ (সা:) সকলের নবী।

আব্দুল্লাহ: তাহলে দাদা ,আমাদের নবীর কথা মানতে হবে না?

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন:

"আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা আগুনে জ্বলিয়ে দেওয়া হয়"^৫

মহেশ: ভাই ,শরীক করা বলতে দেবতাদের কি পূজা করার কথা বুঝিয়েছে?

তাহলে ,মুসলিমরাও তো ঐ কা'বা ঘর কে পূজা করে,সেজদাহ করে।

আব্দুল্লাহ: না দাদা।বিষয়টা তেমন না।আমরা কা'বা ঘর কে সেজদাহ করি না।এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনে বলেন

"তোমাকে অবশ্যই এমন ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছ ,যা তুমি পছন্দ কর। অতএব,মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।"^৬

দাদা, কাবার দিকে ফিরে মানে মুখ করে। কা'বা হলো আমাদের ক্বিবলা,নির্দেশিত পথ।কা'বা কে আমরা ইবাদতের দিক হিসেবে মনে করি।তা পূজা করি না বা সেজদাহ করি না।

ধরেন, একটা আলোচনা সভা শেষে সবাই এক সাথে নামাজ পড়বে।তখন যে যার পছন্দ মত দাড়াতে চাইবে,যদি নির্ধারিত কোন দিক না থাকে।

কেউ পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়াবে তো কেউ পূর্ব দিকে মুখ করে।কেউ আবার উত্তর বা দক্ষিণ দিকে মুখ করে দাঁড়াতে চাইবে।তখন কি হবে দাদা বুঝতে পারছেন?

মহেশ: হ্যা ভাই।তখন তো গোলমাল বেঁধে যাবে! ভীষণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

আব্দুল্লাহ: ঠিক ধরেছেন দাদা।তাই আমরা একতার জন্য ক্বিবলার দিকে মুখ করে নামাজ পড়ি।যে যেখানেই থাকুক না কেন সবাই নির্ধারিত দিকই ফিরে নামাজ পড়বে ফলে কোন মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকল না। বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হলো না।

রেফারেন্স:

(¹)ঋগ্বেদ ১/১৮/৯,

(²)ঋগ্বেদ সংহিতা ১ম খন্ড,৯৬ পৃষ্ঠা।

(³) কঙ্কি পুরাণ ১/২/১১

(⁴)কঙ্কি পুরাণ ১/২/৪

(⁵)মিশকাতুল মাসাবীহ,৬১

(⁶)সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৪৪

গীতা: দিদি,কেমন আছো?

ফাতেমা: আসসালামু আলাইকুম আ'লা বানিত্বাবাআ'ল হুদা। আলহামদুলিল্লাহ ভালো।তুই কেমন আছিস রে ছুটকি?

গীতা: আছি দিদি।তোমাকে ছাড়া আর কেমন থাকব বলো।দিদি, তুমি কেন ঐ পথে গেলে?

ফাতেমা: ছুটকি আমি সত্যকে চিনতে পেরেছি।তাই অন্ধকার রাস্তা থেকে আলোর পথে এসেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

গীতা: দিদি,কি এমন জিনিস তোমাকে ধর্মত্যাগ করতে উৎসাহিত করল? ইসলাম ধর্মে তুমি কি পেল শুনি?

ফাতেমা: অনেক কিছু পেয়েছি ছুটকি।সম্মান, আত্মপরিচয়,সমতা,সঠিক পথের দিশা।

গীতা: তা কিভাবে?

ফাতেমা: ছুটকি তুই বল কোন পাপে ব্রাহ্মণরা আমাদেরকে সমাজ থেকে আলাদা করে রেখেছে ? কেন আমরা শুধু তাদের সেবক শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হব? কেন

আমরা স্কুল,কলেজে যেতে পারব না? কেন মন্দিরে যেতে দেয় না? কেন আমাদের স্পর্শ তারা ছুঁত মনে কর¹

গীতা: সবই কপাল দিদি। আমরা যে 'শূদ্র' জাত।তাই আমাদের অধিকার কম, দায়িত্ব বেশি। আমাদের স্বর্গ ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়দের সেবার মধ্যে।জানো দিদি,আমার মনে হয় আগের জন্মে কোন পাপ করেছিলাম তাই ভগবান শাস্তিস্বরূপ আমাকে শূদ্র জাতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু পুনর্জন্মে আমি এই জাতে আর জন্ম নিতে চাই না দিদি।

ফাতেমা: না ছুটকি। পুনর্জন্ম বিষয়টা এমন না। পুনর্জন্ম হলো পরবর্তী জীবন বা মৃত্যুর পরের জীবন। পুনর্জন্ম মানে এই নয় যে কেউ জন্ম নিবে আবার মৃত্যু হবে আবার জন্ম নিবে এমন চক্র।

তুই জানিস; বেদের কোথাও জন্মচক্র বা পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ নাই।

বেদে পরবর্তী জীবন মানে মৃত্যুর পরের জীবনের কথা বলা আছে²।জন্ম মানুষের একটায় তারপর মৃত্যু পরবর্তী জীবন।আর এটাকেই বলে আখিরাত। আর যদি পুনর্জন্মে অন্ধ,বোবা, প্রতিবন্ধী, বানিয়ে আমাদের শাস্তিই দেওয়া হবে।তারপর জন্মচক্র শেষে আমাদের কর্ম শেষ হলে মৃত্যু হবে,তাহলে স্বর্গ নরক কেন তৈরি করেছেন তাদের ঈশ্বর? সব শাস্তি পৃথিবীতে পেলে নরকের কি প্রয়োজন শুনি?

গীতা: দিদি,তুমি বেদ ধরেছো? ব্রাহ্মণরা জানলে যে, আমাদের কঠিন শাস্তি দিবে।³

ফাতেমা: এখানেই আমার ঘোর আপত্তি। আচ্ছা ধর্মগ্রন্থকে কেন আমরা স্পর্শ করতে পারব না? তাহলে আমরা সৃষ্টিকর্তাকে জানব কিভাবে, চিনব কিভাবে?

কিন্তু ইসলাম ধর্মে এমনটা নেই ছুটকি। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

"আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে"⁴

দেখ ছুটকি কতো সুন্দর কথা। এখানেই মানুষে মানুষে যে কোন পার্থক্য সৃষ্টিকর্তার কাছে নেই তাই প্রমাণ করে। মানুষে মানুষে পার্থক্য হবে তার কর্মে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মাঝে কেন এতো বৈষম্য থাকবে!

অন্যদিকে মুসলিমদের দিকে দেখে এরা সবাই একসাথে মসজিদে নামাজ পড়ে। মুচি,কামার,ব্যবসায়ী, ইনিজনিয়ার,ডাক্তার সবাই এক সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজ পড়ে।তারা সবাই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন মাজিদ স্পর্শ করতে পারে,পড়তে পারে।এজন্যই আমি সত্যকে গ্রহণ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

গীতা: দিদি ,আমিও এই অসম্মানের জীবন থেকে বের হতে চাই।আমিও আলোর পথে চলতে চাই।

রেফারেন্স:

- (1) সিন্ধু থেকে হিন্দু ১১১
- (2)ঋগ্বেদ ১০ স্তবক ১৮ শ্লোক ৪
- (3) সিন্ধু থেকে হিন্দু ১১১-১১২
- (4) সূরা ত্বীন ,আয়াত নং ৪

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111572757/>